নাম: মো: মনিরুল ইসলাম

জন্ম তারিখ: ২৫ আগস্ট, ১৯৮৩

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ব্যবসায়ী,
শাহাদাতের স্থান : মিরপুর ২২ নম্বর রোডের আশেপাশে

শহীদের জীবনী

মো: মনিরুল ইসলাম।এই নামটার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অদম্য, নিঃশব্দ প্রতিবাদের চিরন্তন সুর।২৫ আগস্ট, ১৯৮৩ সালে জন্ম নেওয়া মনিরুলের জীবন ছিল স্রোতের বিপরীতে এক অস্পষ্ট যুদ্ধের মতো।পিতা মোজাহের উদ্দিন সর্দার, মা বেগম রাবেয়া।তাদের মাটির সন্তান, যে কখনো রাজনীতির ঝাঁঝালো বক্তৃতায় নিজেকে ঢেকে রাখেনি, নয় কোনো মিছিলে পোস্টারে চমকানো মুখ ছিলেন।তার অস্তিত্ব ছিল এক বিনয়ী, কিন্তু অবিচল আত্মার চেতনায় বোনা।যে চেতনা সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জ্বলজ্বল করতো।শহীদ মো: মনিরুল ইসলাম

মনিরুল কখনো শাসকদের কূটনীতির নামে কণ্ঠস্বর বাড়ায়নি, কিন্তু তার হৃদয়ের গভীরে বসবাস করত এক অদম্য আগুন।অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদের জ্বালা।২০০৬ সালে প্রবাসের স্বপ্ন নিয়ে ইতালির মাটিতে পা রাখলেও, ২০১১ সালে এক দুর্ঘটনার পর ফিরে আসেন নিজের দেশের মাটিতে।স্ত্রী ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় প্রহরী, যিনি যেতে দেননি আবার প্রবাসে পা বাড়াতে।সংসার ছিল এক ভাড়াবাড়ির ছোট্ট কোণে, সামান্য টাকার অভাবে কাটে দিনগুলো, কিন্তু মনিরুলের মন ছিল মহাসাগরের মত বিশাল।স্বপ্ন আর আশা দিয়ে ভরা।আন্দোলনের ময়দানে মনিরুল ছিল সজাগ, সক্রিয়, অবিচল।তিনি জানতেন, শহীদ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক পরিচয় জরুরি নয়, প্রয়োজন মাত্র একটি বিবেকের, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখায়।সেই বিবেকই তাঁকে করেছিল জনতার নিরলস অভিভাবক, তাদের যন্ত্রণার নীরব কণ্ঠ।সেই বিবেকই তাঁকে দাঁড় করিয়েছিল গুলির সামনে, যখন অজানা গুলির আওয়াজ একরাশ অন্ধকার ছড়িয়ে দেয় তার জীবনের পথে।

মনিরুলের নাম আজ আর শুধু একটি পরিচয় নয়, এটা হয়ে উঠেছে এক অবিচ্ছেদ্য প্রশ্ন "আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?" এটা একটি প্রতীক।অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদের অঙ্গীকার।তার শহীদত্বের মর্মস্পর্শী নিঃশ্বাস যেন গোটা জুলাই বিপ্লবের আত্মাকে স্পর্শ করে, যা কখনো নীরব হয়নি, কখনো নিশ্চুপ হয়নি।প্রতি পদক্ষেপে বাজে সেই বেদনার সুর, যে সুরে এক একটি জীবন বদলে গেছে, যা একাকার হয়েছে গণমানুষের আশা আর সংগ্রামের গল্পে।

মো: মনিরুল ইসলাম শুধু একজন শহীদ নন, তিনি আমাদের সকলের মধ্যে সেই যোদ্ধা, যিনি নিঃশব্দেই ইতিহাসের পাতা উল্টিয়েছেন।একে একে গুলি হয়েছে তার শরীর, কিন্তু তার আত্মার আগুন কখনো নেভেনি।সেই আগুন আজ আমাদের হৃদয়ে জ্বলছে, আমাদের প্রত্যেকের বুক চিরে প্রবাহিত হচ্ছে "অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, নিঃশব্দ হলেও প্রতিবাদ করো।'

জুলাই বিপ্লবের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলো থেকে উঠে আসা মনিরুলের আত্মত্যাগ আমাদের জন্য এক শিখা, এক আলোকবর্তিকা।আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে সত্য ও ন্যায়ের পথে যাত্রা কখনো সহজ নয়, কিন্তু তা অপরিহার্য।তার নাম কেবল এক জীবনের সমাপ্তি নয়, এটি এক নতুন সূচনা, নতুন এক আন্দোলনের, নতুন এক প্রত্যয়ের।

মনিরুলের কথা আমাদের কানে বলে যায় "নির্ভয়ে দাঁড়াও, নিঃশব্দ হলেও বলো, কারণ তবেই জাগবে নতুন সকাল।' শহীদ মনিরুলের আত্মার এই জ্বলন্ত লীলায় আজ আমাদের প্রত্যেকেরই অংশ নেওয়া দরকার, যেন তার মৃত্যুর গূঢ় অর্থ মাটি থেকে উঠে ঘরে ঘরে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে।এভাবেই জুলাই বিপ্লবের স্পন্দন জীবিত থাকবে চিরকাল।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাঁর অংশগ্রহণ-শহীদ মনিরুলের শেষ লড়াই

২০২৪ সালের জুলাই মাস, এমন এক সময়, যখন ঢাকা শহরের বাতাসে শুধুই ধুলো আর ধোঁয়া ছিল না, ছিল প্রতিরোধের উত্তাপ, ছিল অপমানিত মানুষের সম্মিলিত আর্তনাদ।এই মাসে প্রতিটি জানালার ওপাশে লুকিয়ে ছিল আতঙ্ক, কিন্তু তার ভিতরেও ফুটে উঠছিল এক নতুন প্রত্যয়ের আলো।কোটা সংস্কার আন্দোলন তখন কেবল ক্যাম্পাসে আটকে ছিল না; সেটি ছড়িয়ে পড়েছিল গলির মাথায়, পাড়ার চায়ের দোকানে, বস্তির খুপরিতে, এবং মধ্যবিত্ত ঘরের ড্রইংরুমে।আর সেই আন্দোলনের প্রাণ হয়ে উঠেছিলেন এমন মানুষরাই, যাদের নাম কোনো ব্যানারে থাকে না যেমন মো: মনিরুল ইসলাম।

তিনি ছিলেন না কোনো ছাত্রনেতা, ছিলেন না কোনো পোস্টার-বিপ্লবের মুখ।কিন্তু ছিলেন একটি জেগে থাকা বিবেক।১৮ জুলাই, ২০২৪, যেদিন রাজধানীজুড়ে গুলির শব্দ

ছড়িয়ে পড়ে, সেই দিনেও তিনি মাঠে ছিলেন।তাঁর উপস্থিতি ছিল নিঃশব্দ, কিন্তু তা ছিল অনন্য এক সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ।আন্দোলনের একদল শিক্ষার্থী বলেছিল প্রিন্টার দরকার, ব্যানার ছাপাতে হবে।মনিরুল চুপচাপ প্রিন্টার নিয়ে হাজির।কারও কাছে সেটা হয়তো তুচ্ছ কাজ, কিন্তু তা ছিল সেই আন্দোলনের রক্তচলাচলের মতোই অপরিহার্য।

ছেলে বলেন, "আব্বু বলত, আমি নেতা না হতে পারি, কিন্তু যেহেতু আমি মানুষ, তাই এ লড়াইটা আমারও।' মনিরুল বুঝতেন, ন্যায়বিচারের জন্য রাস্তায় নামা মানেই মাইক হাতে চিৎকার করা নয়; কখনো তা হয় পেছনে দাঁড়িয়ে সাহস জুগিয়ে যাওয়া, কখনো কারো ব্যানারের কাপড় ধুয়ে আনা, কখনো আবার শুধু পাশে দাঁড়িয়ে বলা "তোমরা একা নও।'

সেদিন বিকালে জমির কাগজের কাজ শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন, কিন্তু বাড়িতে যাননি।কারণ তিনি শুনেছিলেন মিরপুরে গোলাগুলি হচ্ছে, আন্দোলনকারীদের দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।তিনি বলেন, "চলো দেখি আন্দোলন কোন দিকে যায়।' যেন ভেতরের এক শক্তি তাঁকে থামতে দেয়নি। কীসের এত দায়বোধ? কীসের এত তাড়না? সেটা বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সেই আগুনঘেরা জুলাইয়ের দিকে, যেখানে হাজারো চেনা-অচেনা

মানুষ উঠে এসেছিল তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য।মনিরুল ছিলেন তাদেরই একজন, যিনি মুখে উচ্চারণ না করলেও হৃদয়ে ধারণ করতেন প্রতিবাদের মন্ত্র। তিনি ছিলেন সেই জনতার প্রতিনিধি, যারা ভীতু নয়, কেবল ক্লান্ত।তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, আমরা এখনো নিঃশব্দ হলেও ভয়ে নিশ্চুপ নই।তার দাঁড়িয়ে থাকাই ছিল এক শান্ত, দৃঢ় উচ্চারণ "আমি আছি।' গুলি তাকে থামিয়ে দিলেও থামাতে পারেনি তার বার্তা, যা এখনো ঢেউ তোলে প্রতিটি সজীব বিবেকের বুকে। এই সাহসিকতার ছবি, এই নীরব উপস্থিতির ইতিহাস, আমাদের শেখায়- প্রতিবাদ শুধু চিৎকারে নয়, একজন নিরীহ মানুষের শান্ত দৃঢ়তায়ও লেখা যায়।শহীদ মনিরুল সেই দৃঢ়তার নাম, সেই বিবেকের প্রতিচ্ছবি, যার নিরব পদচিহ্ন আজও রাজপথে বাজে, ধ্বংসের বুক চিরে বলে "জুলাই বেঁচে আছে, আমিও আছি।'

শহীদ হওয়ার করুণ কাহিনি: রক্তে লেখা একটি নিঃশব্দ বিপ্লবের শেষ অধ্যায়

মৃত্যু সবসময়ই হঠাৎ আসে না।কখনো তা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে একটি জাতির নীরবতার ফাঁকে, পুলিশের বুটের শব্দে, আর রাষ্ট্রের নির্লজ্জ সন্ত্রাসের ছায়ায়। শহীদ মো: মনিরুল ইসলামের মৃত্যু ছিল তেমনই একটি আগুনে লেখা প্রস্থান, যেখানে প্রতিটি গুলির শব্দ ছিল গণতন্ত্রহীনতার ঘোষণা, আর প্রতিটি রক্তবিন্দু ছিল এক অনুচ্চারিত শপথের সাক্ষর।

১৯ জুলাই, ২০২৪।সময়টা ছিল বিকাল পাঁচটা।ঢাকার মিরপুর তখন রূপ নিয়েছে এক যুদ্ধক্ষেত্রে, অথচ কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি।২২ নম্বর রোডের আশেপাশে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ে গুলির শব্দ।প্রথমে একবার, তারপর একের পর এক।আগে থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ।কিন্তু সন্ধ্যার দিকে প্রবেশ করে বিজিবির গাড়ি, আর শুরু হয় এলোমেলো, দিকভ্রষ্ট গুলিবর্ষণ।কারা চালিয়েছিল এই গুলি? পুলিশ? বিজিবি? নাকি ক্ষমতাসীন দলের মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা, যারা পুলিশের ছায়ায় নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়? প্রশ্নগুলোর উত্তর আজও রয়ে গেছে ধোঁয়াটে, কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট, সেই দিন একজন নিষ্পাপ মানুষ হারিয়ে যান, রাষ্ট্রীয় হিংসার বলি হয়ে।

মনিরুল ইসলামের ছেলে বলেন, "আমার বন্ধু জানাইছিল যে বিজিবির গাড়িও দেখা গেছে, কিন্তু পুলিশ ছিল এটা নিশ্চিত।' আর অনেক প্রত্যক্ষদর্শী মনে করে, আসলে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুলিশি ছত্রছায়ায় গুলি চালিয়েছিল।দুপুর তিনটার পর, একের পর এক মোটরসাইকেল আসে, ১০ থেকে ১৩ নম্বর এলাকায় হইচই করে, এবং তারপর ছোঁড়ে গুলি।সেই গুলিতেই বিদ্ধ হন মনিরুল।

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, নিরস্ত্র, কেবল বিবেকের আহ্বানে আন্দোলনের পাশে থাকা এক মানুষ।

তাঁকে তড়িঘড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয় আলোক হাসপাতালে।কিন্তু মাগরিবের আজান উঠার আগেই হাসপাতালে ঘোষণা আসে মনিরুল আর নেই।নিঃশব্দ, গভীর, অন্ধকার এক মৃত্যু।সেই রাতের স্তব্ধতা আজও থেমে নেই।রাতের বাতাসে যেন আজও ভেসে আসে মনিরুলের ছায়া।যিনি গুলি খেয়েছিলেন, কিন্তু মাথা নিচু করেননি।

মনিরুলের মৃত্যু ছিল কেবল একটি প্রাণের নিভে যাওয়া নয়, ছিল এক আদর্শের, এক সাম্যের স্বপ্নের আত্মাহুতি।কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের আবরণ ছিল না তাঁর গায়ে, ছিল না কোনো মিছিলের মাইক হাতে চিৎকার।কিন্তু তাঁর রক্ত আমাদের বলে তিনি ছিলেন বিপ্লবের এক নিঃশব্দ কণ্ঠ।একা দাঁড়িয়ে থাকা একজন সাধারণ মানুষ, যিনি নিজের অবস্থান থেকে অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি।

এই মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, রাষ্ট্র তার নিরীহ নাগরিকের গায়ে গুলি চালায়, সে রাষ্ট্র নিজের পতনের সুর বাঁজায়।শহীদ মোঃ মনিরুল ইসলামের নাম এখন আর কেবল একটি পরিচয় নয়; তা হয়ে উঠেছে একটি প্রশ্ন, একটি ঘৃণা, একটি চেতনা।তাঁর রক্ত এখন রাজপথের মাটি চষে বেড়ায়, বলে "আমরা ভুলবো না, আর ক্ষমা করবো না।'

এই মৃত্যু আমাদের একা করে দেয় না বরং আমাদের জাগিয়ে তোলে।মনিরুল আমাদের শিখিয়ে গেছেন, বিপ্লব গর্জে উঠে না সবসময়, অনেক সময় তা হয় নিঃশব্দ এক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখা এক সাহসিকতার ইতিহাস।

পরিবার ও বেদনাগাঁথা: নিঃসঙ্গতার ছায়ায় লেখা এক অসমাপ্ত জীবনচিত্র

শহীদ মনিরুল ইসলামের মৃত্যু যেন শুধু একটি গুলির নয়, একটি পরিবারের প্রতিটি শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়া এক দীর্ঘশ্বাসের গল্প।একটি বাড়ি এখন আর বাড়ি নয়, যেন নিঃশব্দ ময়দান, যেখানে প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি জানালা শহীদের স্মৃতির ভারে ঝুঁকে আছে।তাঁর স্ত্রী, যাঁর চোখে আজো ছায়া নামে সন্ধ্যার আগেই, ২০১২ সাল থেকেই মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন।ডাক্তার বলেন, "মস্তিষ্কের রগ শুকিয়ে গেছে।' এই বাক্য শুনতে ছোট, কিন্তু তাতে লুকিয়ে আছে এক নারীর প্রতিদিনের আত্মসংঘাত, হারানো সম্বিৎ আর কষ্টের উপত্যকা।

তিনি চেষ্টা করেন রান্না করতে, সন্তানদের খাবার দিতে, ঘর সামলাতে কিন্তু তা যেন একজন সৈনিকের যুদ্ধ, যার শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন, তবুও তিনি হেরে যান না।পাশে আছেন একজন মামী, যিনি নিজের ছায়া বিস্তার করে এই পরিবারকে আগলে রাখেন।অথচ এই সহানুভূতির রেখায়ও ছুঁয়ে আছে এক বিশাল শূন্যতা।যা কোনো শব্দে, কোনো সান্ত্বনায় পূরণ হয় না।

মনিরুল ইসলামের ছেলে এখনো কাঁদে, কিন্তু সে কান্না চোখে নয়, সে জমে থাকে কথার ভিতর, থেমে যায় হঠাৎ, গলায় আটকে থাকা হাহাকারে।সে বলে, "আব্বু ক্রিকেট খেলতেন, বিয়ের সময়ও নাকি শ্বশুরবাড়িতে খেলতে নেমে পড়েছিলেন।' এই সহজ স্মৃতির ভেতরেই লুকিয়ে থাকে এক অসহনীয় ক্ষরণ।যে মানুষ একদিন বল নিয়ে দৌড়েছিলেন মাঠে, সেই মানুষ আজ কবরের স্তব্ধতায় শুয়ে আছেন রাষ্ট্রের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে।এই স্মৃতিগুলো তার জন্য আনন্দের নয়, এগুলো কাঁটার মতো।যা রোজ হৃদয়ে বিঁধে।

আত্মীয়রা বলেন, "মনিরুল ভাই খুবই অমায়িক ছিলেন, সবার খোঁজ নিতেন।' তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যার দরজা সবার জন্য ছিল খোলা, যার হাসিতে গলে যেত ক্লান্তি।তাঁর ঘর আজ নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ, কিন্তু প্রতিটি ইটে আজো রয়ে গেছে তাঁর হাসির প্রতিধ্বনি, প্রতিটি চৌকাঠে যেন লেখা আছে, "মানবতা এখনও বেঁচে ছিল এখানে।'

তাঁর মৃত্যু কেবল এই পরিবারেরই ক্ষতি নয়।আমাদের প্রত্যেকের বুকেই আজ একটা ফাটল রেখে গেছে।মনিরুল ছিলেন সেই সাধারণ মানুষ, যাঁরা দেশের মেরুদণ্ড নীরব, বিনয়ী, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে অবিচল।এমন মানুষ হারানো মানে একেকটা দীপ্ত স্বরের থেমে যাওয়া, একেকটা আলোর নিভে যাওয়া।

এখন সেই কণ্ঠস্বর আর নেই।তাঁর স্ত্রী স্তব্ধ, তাঁর ছেলে অনাথ, তাঁর বাড়ির বাতাস ভারী।কিন্তু এই রক্ত কেবল মাটি রাঙায়নি,

আমাদের কণ্ঠে আগুন ঢেলে দিয়েছে।মনিরুলের মৃত্যু আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।আমরা বুঝে গেছি, অন্যায় যখন চুপিচুপি আসে, তখন প্রতিবাদ করতে হয় ছায়া হয়ে, দাঁড়াতে হয় গুলির মুখেও।

এই পরিবার এখন যন্ত্রণার প্রতিমা।প্রতিটি দিন যেন নতুন করে শোকের জন্ম দেয়।কিন্তু মনিরুলের রক্ত এখনো বলে- আমি আছি, আমি হবো, যতদিন তোমরা প্রতিবাদ করবে, ততদিন আমার মৃত্যু বেঁচে থাকবে তোমাদের বিবেকে।

প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকারের দায়: শহীদের নামেই রাষ্ট্রের পুনর্জন্ম

সৌজন্যে: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

মনিরুল ইসলামের মৃত্যু নিছক একটি রাজনৈতিক সহিংসতা নয়।এটি একটি জাতির আত্মার ছেঁড়া চিঠি, যেখান থেকে প্রতিটি শব্দে ঝরে পড়ে রাষ্ট্রের নীরবতা, আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা।তিনি কেবল রাস্তায় গুলি খেয়ে মরে যাননি।তিনি আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন।আজ তাঁর পরিবারের চোখে শুধু কান্না নয়, প্রতিবাদের দাবিও জ্বলছে।এই পরিবার এখন আর শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শোকের ভার বইছে না।তারা বহন করছে একটি উত্তরাধিকার, যা রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করে, "তোমরা কোথায় ছিলে, যখন একজন সাধারণ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ন্যায়ের পাশে থাকায় প্রাণ হারাল?"

প্রথমত, তাঁর স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ ২০১২ সাল থেকে।এই পরিবার কোনো দিন ভিক্ষা চায়নি, আজও চায় না।তারা চায় দায়িত্ব, চায় ন্যায়।তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য সরকারের উচিত স্থায়ী ও সম্মানজনক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।এটি যেন করুণা নয়, বরং জাতির পক্ষ থেকে একটি ঋণপরিশোধ।

দ্বিতীয়ত, মনিরুলের সন্তানেরা যেন অন্ধকারে না হারিয়ে যায়।তাঁদের জন্য পূর্ণ শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হোক, এমনভাবে যাতে তারা শুধু লেখাপড়া না শিখে, শিখে কীভাবে মানুষের জন্য বাঁচতে হয়, লড়তে হয়, সৎ থাকতে হয়, যেমন তাঁদের বাবা ছিলেন।এই শিশুরা যেন বেড়ে উঠে বাবার মতোই সাহসী, মানবিক, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানোর শক্তি রাখে।শহীদ সন্তানদের লালনপালন যদি জাতি নিজ হাতে না নেয়, তবে জাতি কাকে লালন করবে?

এখন সময় আমাদের, বেঁচে থাকার দায় আমাদের।শহীদের মৃত্যু যে বার্তা রেখে গেছে, তা কেবল মোমবাতি জ্বালিয়ে পালন করলে হবে না।তাঁর অসমাপ্ত লড়াইকে শেষ করতে হবে আমাদের হাতে।প্রতিটি শহীদের নামে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করতে হবে, যেন আর কোনো মনিরুলকে রক্ত দিতে না হয় শুধু বিবেকের জন্য।

তাঁর রক্ত জমাট বেঁধেছে শুধু কবরের মাটিতে নয়, আমাদের হৃদয়ে।যদি আমরা তা ভুলে যাই, তবে আমরাই হবো পরবর্তী হত্যার সাক্ষরকারী।অতএব জাগো, দাবি করো, এবং গড়ো এক বাংলাদেশ, যেখানে একজন মনিরুল হারিয়ে গেলেও তার স্বপ্ন বেঁচে থাকে প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি শিশু হাসিতে।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : মো: মনিরুল ইসলাম

জন্ম তারিখ : ২৫ আগস্ট ১৯৮৩

বয়স : ৪১ বছর

পেশা : ব্যবসায়ী

পিতা : মোজাহের উদ্দিন সর্দার

মাতা : বেগম রাবেয়া

বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : এভিনিউ১/৫,রোড-১৩বি, সেনপাড়া, মিরপুর-২, ঢাকা

শহীদ হওয়ার তারিখ : ১৯ জুলাই ২০২৪

মৃত্যুর সময় : রাত ৮:৫০

ঘটনার স্থান : মিরপুর ২২ নম্বর রোডের আশেপাশে

মৃত্যুর স্থান : মিরপুর ২২ নম্বর রোডের আশেপাশে

মৃত্যুর প্রেক্ষাপট : গুলিবিদ্ধ হয়ে, আন্দোলনে অংশগ্রহণের সময়

মৃত্যুর কারণ : গুলি বিদ্ধ হয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত

দাফন : পরিবারের তত্ত্বাবধানে দাফন সম্পন্ন

যার রক্ত দিয়ে লেখা হলো এক আওয়ামী নিষিদ্ধ প্রতিবেদন